आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI
उपाचार्य
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

विश्वभारती
VISVA-BHARATI
(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)
संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर
FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

शांतिनिकेतन - 731235
SANTINIKETAN - 731235
जि.वीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No.______________ दिनांक/Date.______________

তৃতীয় বার্তালাপ

আমার সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে বিশ্বভারতীর উপর নির্ভরশীল বন্ধুদের উদ্দেশে—

৬ জুলাই ২০২০

আমার আগের বার্তালাপগুলির সূত্র ধরে এই বার্তালাপটিতেও আমি পুনরায় আপনাদের আপন অন্তঃসমীক্ষার আহ্বান জানিয়ে শুরু করতে চাই। আসুন, আমরা বোঝবার চেষ্টা করি, বিশ্বভারতীর সঙ্গে আমাদের আবেগগত সম্পর্কের হেতু কী? বিশ্বভারতীর উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে এইটাই কি হেতু;— না কি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মহান উত্তরাধিকার দ্বারা আমারা সত্যিই অনুপ্রাণিত? আমি আবারও বলছি, অন্য কাউকে দোষারোপ করা বা তাঁদের উপর দায় চাপিয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য বীরভূমের এই একতম 'শিল্প'— বিশ্বভারতীর অন্নজলে আমরা যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিপালিত হচ্ছি তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির প্রতি একরকমের 'আপনবোধ' জাগিয়ে তোলা। বিশ্বভারতীকে একটি 'শিল্প' হিসেবে অভিহিত করে আমি বোঝাতে চাইছি, এই প্রতিষ্ঠান আমাদের অস্তিত্বের মূল আধার তো বটেই, সেইসঙ্গে আমাদের মধ্যে অনেকে এটিকে অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জনের একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। যাঁরা এখানে কর্মরত, তাঁরা নিয়মিত ভদ্রঅঙ্কের বেতন পেয়ে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান, তাঁদের পথনির্দেশনা; এককথায় শিক্ষাক্ষেত্রে মোট অর্জন এবং প্রশাসনিক নৈপুণ্যের বিচার করলে সেই বেতন-অনুপাতে আমরা কতটুকু প্রতিষ্ঠানকে প্রতিদান দিতে পারছি সেই প্রশ্নের উত্তর আমার ঠিক জানা নেই! ন্যাক-এ বি+ গ্রেডপ্রাপ্তি বা এনআইআরএফ-এর মানদণ্ডে খারাপ ফল লোকচক্ষে আমাদের খাটো করেছে, কিন্তু আমরা প্রশাসনের ঘাড়ে তার দায়ের বোঝা তুলে দিয়ে দিব্যি হাত ধুয়ে ফেলছি। কিন্তু এইভাবে এই গরিমাময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আজকের সমস্যার মূলে পৌঁছনো যাবে না— যার সঙ্গে কিনা ভারতের একজন মহামনীষীর নাম জড়িয়ে আছে! বিশ্বভারতীর 'প্রশ্নাতীত' গৌরবগাথার দিবাস্বপ্ন এখন বালি দিয়ে দুর্গনির্মাণের মতো অলীক মনে হয়। বাইরে থেকে বিশ্বভারতী হয়তো এখনও অনন্য, কিন্তু অন্তঃসারে সে এখন রুগ্ন। সেইজন্যই এখন প্রয়োজন

উদ্ভাবনাময় এমন পরিবর্তনসাধন যাতে তা সৃজনশীলতার সঙ্গে তার অস্তিত্ব রক্ষায়ও সংগতিপূর্ণ হতে পারে। এটা খুবই সম্ভবপর, কারণ বিশ্বভারতীতে যোগ্যজনের অভাব নেই। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেকেই সচেষ্ট যাঁরা শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ-বিকাশের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বভারতীকে সমুচ্চ স্থানে তুলে ধরতে দৃঢ়সংকল্প।

বিশ্বভারতীর দুটি স্বমহিমামণ্ডিত উৎসব হল: ক)পৌষমেলা তথা পৌষ-উৎসব এবং খ) বসন্তোৎসব— যা দোলপূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই দুই উৎসবে আকৃষ্ট হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ শান্তিনিকেতনে ছুটে আসেন; এবং তারফলে যাঁরা সারাবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করে থাকেন তাঁদের কাছেই ক্যাম্পাসে চলাফেরা দায় হয়ে ওঠে। যাঁরা পৌষমেলা এবং বসন্তোৎসব প্রাঙ্গণের কাছাকাছি বাস করেন তাঁদের কাছে এই উৎসবের দিনগুলি দুঃস্বপ্নের চেয়ে কিছু কম নয়। সেইজন্যে এই প্রসঙ্গ আমি সংক্ষেপে কিছুটা তুলে ধরব।

এই বার্তালাপে আমি বিশেষ করে পৌষমেলা ও পৌষ-উৎসব নিয়েই কথা বলব। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এখানে পৌষমেলার সূচনা করেন, যাতে বারকয়েক ছেদও পড়েছিল। গুরুদেব যখন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই পৌষ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সূচনা করলেন, তখনও; এবং সেই থেকে এখন পর্যন্ত এই তারিখেই প্রতিবছর মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পৌষ-উৎসব ও পৌষমেলা সমান্তরালভাবে উদ্‌যাপিত দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়ের অনুষ্ঠান। পৌষ-উৎসবের মধ্যে রয়েছে ছাতিমতলায় উপাসনা, খ্রিস্টোৎসব, বিদ্যালয়-পর্যায়ের সমাবর্তন এবং এইরকম আরও অন্যান্য আশ্রমিক কৃত্যাদি। অন্যদিকে গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং পল্লিমানুষের দুঃখ-দৈন্য থেকে উত্তরণের একটা প্রকল্প হিসেবে গুরুদেব পৌষমেলাকে গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। ১৯০৪ সালে প্রণীত তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা বিশদে ব্যক্ত করেছিলেন। সেইসময় এই ভাবনাটা কাজ করেছিল যে মেলায় গ্রামীণ শিল্পীদের নৈপুণ্য, তাঁদের শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হবে; এবং সেইসব সামগ্রী বিক্রি করে তাঁরা দুপয়সা আয় করতে পারবেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে যাতে তাঁদের আত্মনির্ভরতা অর্জন হতে পারে— এই ছিল মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য। অতীতের নথিপত্র দেখলে বোঝা যায় এটা ছিল একান্তভাবেই একটা গ্রামীণ মেলা।

গুরুদেবের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন অছিনামা(শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ডিড) অনুসারে শান্তিনিকেতন ট্রাস্টই হল এই মেলার একমাত্র বিধিবদ্ধ আয়োজক। কিন্তু কালক্রমে এটা অলিখিত একটি প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে যে বিশ্বভারতীকেই এই মেলা-পরিচলনার সব দায়-দায়িত্ব নিতে হয়। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এতবড় একটা কাণ্ড পরিচালনার বস্তুত কোনও পরিকাঠামোই নেই! ফলত, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিশেষ গোষ্ঠীর উপর মেলা-পরিচালনার দায়িত্ব থাকত; এবং ২০১৯ সালের আগে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করতেন। যদিও মেলার প্রকৃত দায় বিশ্ববিদ্যালয়েরই! একটা বিশেষ গোষ্ঠী যে মেলা-পরিচালনায় উৎসাহিত ছিল তার একটা বড় কারণ তাদের আর্থিক লাভ হত এই মেলা থেকে, যেটা তারা মেলায় স্টল বন্টন করে এবং ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করত। পুরনো নথিপত্র ঘাঁটলে বোঝা যায় বিশ্ববিদ্যালয় বা ট্রাস্টি— কোনও পক্ষই নিবিড়ভাবে এই মেলার সঙ্গে যুক্ত হত না। এমনকি ২০১৮ সালে উপাচার্য হিসেবে আমার যোগদানের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত মেলায় আমাকেও কেবল দর্শক করেই রাখা হয়েছিল। আমি সারাটা সপ্তাহ বিনোদন মঞ্চে লোকসংস্কৃতির নানা পরিবেশনা দেখেই

মেলা-উদ্‌যাপন করেছি; যেহেতু আমাকে বোঝানো হয়েছিল এই মেলায় উপাচার্যের ভূমিকা বলতে রয়েছে কিছু আনুষ্ঠানিক কৃত্য! একদিন এই মেলার আয়-ব্যয়ের খতিয়ান আমার নজরে এল। আয় আর ব্যয়ের অসামঞ্জস্য দেখে আমি চমকে উঠলাম! মেলায় ঘাটতির বহর দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম; যে ঘাটতি-অর্থ কি না বিদ্যুৎ, সিসিটিভি, কন্ট্র্যাক্টর ইত্যাদি বিবিধ পরিষেবা-প্রদানকারীদের পরিশোধ করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কেই! এই রূঢ় বাস্তবতা থেকে আমার হৃদয়ঙ্গম হল, কেন একজন প্রাক্তন উপাচার্য ব্যঙ্গ করে মেলাকে 'মধু' বলে অভিহিত করেছিলেন! বুঝতে পারলাম, এই হিসাব-বহির্ভূত লাভের কড়ি পাছে ফসকে যায় বলেই চলতিপন্থা থেকে বেরিয়ে অন্যভাবে মেলা-পরিচালনার ভাবনা কখনও ভাবা হয়নি!

এরসঙ্গে আবার মেলায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রদত্ত দূষণ-নিয়ন্ত্রণ শর্তাবলি লঙ্ঘন করার দায়ে জাতীয় পরিবেশ আদালত কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় অভিযুক্ত হয়। বিশ্বভারতী জাতীয় পরিবেশ আদালতের শর্ত লঙ্ঘন করেছে এই অভিযোগে একজন স্বঘোষিত পরিবেশবিদ্‌ একের পর এক মামলা ঠুকতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে এইসব মামলা-মোকদ্দমার জন্য লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়, যে-অর্থের একপয়সাও অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ বা মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রক কদাপি মঞ্জুর করে না। শর্ত-অনুযায়ী যে মেলা চারদিনে সম্পন্ন হওয়ার; এবং তারপরের দুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গুটিয়ে ফেলার কথা ছিল তা নির্ধারিত সময়ের পরও চলতে থাকায় জাতীয় পরিবেশ আদালত বিস্মিত ও বিরক্ত হয়। আদালতের নির্দেশ ছিল মেলাশুরুর পর সপ্তম দিনে মেলাপ্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে। এই শর্ত তখন পালন করা হয়নি, এবং নির্ধারিত সময়ের পরও মেলা চলতে দেওয়া হয়েছিল। শর্তের অন্যথা হওয়ার কারণে পরিবেশ আদালত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে সমন ধরায়। ২০১৭ সালে ১৪ দিন ধরে পৌষমেলা চলতে থাকে। জাতীয় পরিবেশ আদালতের শর্তলঙ্ঘনের দায়ে আদালত উপাচার্য, কর্মসচিব এবং বীরভূমের জেলাশাসককে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার এত্তেলা পাঠায়। মেলার প্রকৃত আয়োজক বিশ্বভারতী যেখানে আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়ই, অধিকন্তু পরিবেশ-আদালতের মামলা-মোকদ্দমায় নাজেহাল হয়; সেখানে আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুরা স্টল দিয়ে বেশ ভালই অর্থোপার্জন করেন! সোজাকথায়, ন্যায়ের এ এক পরিহাসময় দশা! ২০১৭ সালের পয়লা নভেম্বর জাতীয় পরিবেশ আদালত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেন, 'মেলা শুরুর চতুর্থ দিনে যেভাবেই হোক মেলা গুটিয়ে নিতে হবে।' একটি নিম্নরেখার নজরটান যুক্ত করে এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন তাঁরা তাঁদের ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের রায়ে, যেখানে বলা হয়েছে: '৩ থেকে ৪ দিন পর্যন্তই মেলা চলতে পারে।'

কোনও পরিস্থিতিতেই আমরা দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এই মেলা বন্ধ করে চাইনি। সেইজন্যই আমরা সচেষ্ট হয়েছিলাম কীভাবে এটি আরও উত্তমভাবে সম্পন্ন করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনে। সম্ভাব্য পন্থানির্দেশের জন্য আমরা রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ তথা বিশ্বভারতী কোর্টের সদস্য ড. স্বপন দাশগুপ্তের শরণাপন্ন হই। তিনিও এব্যাপারে সহমত পোষণ করেন যে বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এমন বিপুল একটা আয়োজন করা অসম্ভব। এরজন্য চাই অনুষ্ঠান-পরিচালনে পারদর্শী বিশেষ অনুষদ। রাজ্যসভায় তিনি তাঁর এই বক্তব্য উত্থাপন করেন। আমাদের মাননীয় আচার্য তথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদী ঐতিহ্যমণ্ডিত পৌষমেলা কীভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আমাকে দিল্লিতে তলব করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন বিশেষ যুগ্মসচিবকে নির্দেশ দেন এই ব্যাপারে বিশ্বভারতীকে সাহায্য করার জন্য।

যুগ্মসচিবের সঙ্গে আলোচনার সময় আমি অতীতের মনোমুগ্ধকর মেলার উল্লেখসহ বিশ্বভারতীর পক্ষে বর্তমানে মেলা-আয়োজনে উদ্ভূত সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করি। সেখানে আমার উত্থাপিত প্রসঙ্গগুলির কয়েকটি নীচে উল্লিখিত হল।

আমাদের পক্ষে (নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে) মেলাভাঙা সম্ভব নয় কারণ: (ক) আমাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী নেই। (খ) মেলাভাঙার পর মেলার মাঠজুড়ে আবর্জনার স্তূপ ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে থাকে মাসের পর মাস। এবং (গ) মেলার স্টলবণ্টনের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই নিয়ম-নীতির বিচ্যুতি ঘটে থাকে। এই তিনটি বিষয়েরই সমাধান পাওয়া গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সৌজন্যে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমরা পেয়েছিলাম ১০০জন অবসরপ্রাপ্ত বাহিনী-সদস্য। নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মেলাভাঙার দুঃসাধ্য কাজটি যাঁদের সাহায্য ছাড়া সম্পন্ন করা খুব সহজ হত না। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর আমাদের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন সত্য সাঁই ট্রাস্টের ১৮০জন ব্যক্তিকে, যাঁরা মেলার চারদিনের প্রত্যেকদিন সারারাত আবর্জনা পরিষ্কার করেছেন। এমনকি আমরা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বদান্যতায় বায়ো-টয়লেটও পেয়েছিলাম যা মেলার দর্শনার্থী এবং ব্যবসায়ী-দোকানদারদের খুবই কাজে লেগেছিল। স্টলবণ্টনে অনিয়ম যাতে না হয় তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর খড়্গপুর আইআইটি-র বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে অনলাইন স্টলবুকিঙের বন্দোবস্তও করে দেন।

জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশাবলি তাঁরা মেনে চলবেন জানিয়ে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ আমাদের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বোলপুর ব্যবসায়ী সঙ্ঘের প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীসুনীল সিং, শ্রীসুব্রত ভগত, শ্রীআমিনুল হুদা, শ্রীআঙ্গুর খান প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। যাঁরা মেলায় স্টলভাড়া নিয়েছিলেন তাঁদেরও সবাইকে স্টলপ্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত শর্তাদির আওতায় নিয়ে আসা হয়। সেইসঙ্গে তাঁদের এও বলে দেওয়া হয় যে, এবারের মেলার সময়সীমা হবে ঠিক চারদিন; এবং মেলাশেষের পর আর কোনও বিকিকিনি করা যাবে না। এও জানিয়ে দেওয়া হয়, মেলাশেষের পর অতিরিক্ত ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে কেবলমাত্র স্টল গুটিয়ে নেওয়ার জন্যই। ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ শ্রীসিং, শ্রীভগত এবং শ্রীহুদা দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ আমাদের ক্যাম্প অফিসে আসেন, এবং চারদিনে মেলা গুটিয়ে দেওয়া হলে শারীরিকভাবে ক্ষতিসাধনসহ আরও নানারকম ফলভোগ করার হুমকি দেন তাঁরা বিশ্বভারতীর যুগ্মসচিব(গণনাধিকারিক) শ্রীসঞ্জয় ঘোষকে। তাঁরা আমার এবং আমার সহকর্মীদের (মহিলা সহকর্মীসহ) উপস্থিতিতেই এই হুমকি দেন। আমাদের মহিলা সহকর্মীরাও তাঁদের কাছে অপদস্থ হন। আমরা তৎক্ষণাৎ শান্তিনিকেতন থানায় একটি এফআইআর দাখিল করি। ২৮ এবং ২৯ ডিসেম্বর আমরা মেলাপ্রাঙ্গণে যাই এবং পরিবেশ আদালতের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্টলমালিকদের স্টল গোটাবার জন্য করজোড়ে অনুরোধ করি। ৩০ এবং ৩১ ডিসেম্বর মেলার পরিবেশ-বিষয়ক অন্যতম উপদেষ্টা শ্রীজয়ন্ত মিত্রের উপস্থিতিতে আমরা ময়লা-মলিন মেলাপ্রাঙ্গণ আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় পরিষ্কার করি। স্টলওয়ালাদের ব্যবহৃত অস্থায়ী শৌচাগারের অবস্থা এতটাই পূতিগন্ধময় ছিল যে অনেকক্ষেত্রে মানববর্জ্যও আমাদের পরিষ্কার করতে হয়েছে। আমাদের বিশ্বভারতীর সমবেত প্রযত্নে পয়লা জানুয়ারি আমরা মেলাপ্রাঙ্গণকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হই। যাঁরা মেলাপ্রাঙ্গণের চারপাশের বাসিন্দা; যাঁরা শান্তিনিকেতন থানায় থাকেন তাঁরাও, নিশ্চয় আমাদের এই দাবির সপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন।

নির্ধারিত সময়ের পর মেলায় বিকিকিনি বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিশোধস্পৃহাবশত ব্যবসায়ীদের কিছু স্বঘোষিত নেতা আমাদের বিশ্বভারতীর বিশেষ বাছাই কয়েকজন প্রশাসনিক কর্মীর বিরুদ্ধে 'শ্লীলতাহানি'র অভিযোগ দায়ের করেন, যা না কি ২৯ ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত হয়েছিল! বাছাই করা অন্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে স্টলের মালপত্র লুটপাটের অভিযোগ আনা হয়। সেদিনের ভিডিয়ো ফুটেজ এবং ফটোগ্রাফ দেখলে বোঝা যায় যে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশ্বভারতীর শুভানুধ্যায়ীসহ শতাধিক ব্যক্তি (পিএমও-প্রেরিত নিরাপত্তাকর্মীদের কথা যদি বাদও দিই!) তখন মেলাপ্রাঙ্গণে ছিলেন আমাদের সঙ্গে। এমতাবস্থায় 'শ্লীলতাহানি'র অভিযোগ (যদি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নাও বলি!) যে কতখানা অসার সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যাই হোক, এবিষয়ে আমি আর বেশি বলতে চাই না যেহেতু বিষয়টি এখনও তদন্তাধীন।

আমার পরবর্তী বার্তালাপে আমি 'বসন্তোৎসব'-এর বদলে-যাওয়া চরিত্র নিয়ে কথা বলব শুধু এটা বোঝাতে যে, বছরের পর বছর কীভাবে এই উৎসবের অপকর্ষ ঘটেছে। এসবই হতে পেরেছে কারণ বিশ্বভারতীর সঙ্গে আমাদের 'আপনবোধ' বা স্বত্ববোধ তৈরিই হয়নি!

আমি কথা শেষ করছি এই বলে যে, বর্তমানের বিশ্বজোড়া দুঃসময়ে আপনারা নিরাপদ থাকুন; এবং মনের খুব গভীরে মুদ্রিত করে রাখুন সেই বিখ্যাত প্রবচন: 'একতাই বল। অনৈক্যে রসাতল।'

আস্থা রাখুন। 'হবেই হবে'।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৪/৭/২০২০

•বিশ্বভারতী• শান্তিনিকেতন

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India